দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ SEP. 1 0 1999
পৃষ্ঠা ৬

প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের লক্ষ্যে

সাম্প্রতিককালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে ভর্তি হওয়া ছাত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও সেখানে তারা থাকছে কম। শিক্ষার প্রাথমিক পর্ব শেষ না করেই স্কুল থেকে ঝরে পড়ছে অনেকে। এই হার শতকরা ৩০ থেকে ৪০। এর ওপরে আরও শতকরা ১০ জন রয়েছে যারা স্কুলে ভর্তিই হয় না। এই শিক্ষাহীন অবস্থাতেই তারা প্রবেশ করে কৈশোরে। সম্প্রতি ঢাকায় অনুষ্ঠিত এক সেমিনারে এই তথ্য তুলে ধরে এ ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে।

আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সামগ্রিক চিত্রটি এখনও সুখকর নয়। সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার কাজ এখনও অনেক বাকি। দেশের বিপুলসংখ্যক মানুষ আজও অক্ষরজ্ঞানহীন। আর ওপরে উল্লিখিত তথ্য থেকেই বোঝা যায়, স্কুল থেকে ঝরে পড়ার হার এখনও শতকরা তিরিশ থেকে চল্লিশ ভাগ। যারা স্কুলে যায় না কিংবা কিছুদিন স্কুলে পড়ার পর স্কুল ছেড়ে দেয়, তাদের প্রধান সমস্যা দারিদ্র্য। অল্পবয়সে সংসারে আয় করার জন্য তাদের লেখাপড়া ছেড়ে কাজ করতে হয়। দারিদ্র্যের কারণেই দরিদ্র পিতামাতা লেখাপড়ার পরিবর্তে ছেলেমেয়েদের কাজে লাগিয়ে দিতে আগ্রহী হন বেশি।

দেশে শিক্ষার উন্নয়ন ও শিক্ষার বিস্তারে বিভিন্ন সময়ে বেশকিছু কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করাসহ বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ ইত্যাদি পদক্ষেপের কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়।

তবে এ প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় এখানে উল্লেখ করা যায়, যাতে আশাবাদী হওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। দেশে শিক্ষার ব্যাপারে সার্বিক মনোযোগ অনেক বেড়েছে এবং শিক্ষিতের হারও বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। কিছুদিন আগে প্রকাশিত ইউএনডিপি'র এক রিপোর্ট থেকে জানা যায়, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতসহ বেশকিছু খাতে দেশে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ের এক অর্থনৈতিক সমীক্ষায় দেখা গেছে, গত ৯ বছরে প্রাথমিক পর্যায়ে ছাত্রছাত্রী ভর্তির হার ৫০ শতাংশের বেশি বেড়েছে। একই সময়ে প্রসার ঘটেছে নারী শিক্ষারও। শিক্ষকতায় মহিলাদের অংশগ্রহণও বেড়েছে। প্রকাশিত এক রিপোর্ট থেকে জানা যায়, ১৯৯০ সালে প্রাথমিক পর্যায়ে ভর্তি হওয়া ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ১ কোটি ২০ লাখ ৫০ হাজার। ছাত্রছাত্রীর অনুপাত ছিল ৫৫:৪৫। ৯ বছর পরে প্রাথমিক পর্যায়ে ভর্তি হওয়া ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ কোটি ৮৩ লাখ ৬০ হাজার। ছাত্রছাত্রীর অনুপাত দাঁড়িয়েছে ৫২:৪৮।

উল্লিখিত ৯ বছরে দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে যে স্বাভাবিকভাবে ভর্তির হারও কিছুটা বাড়বে, এ কথা মনে রেখেও বলা চলে উল্লিখিত পরিসংখ্যানে ছাত্রছাত্রী ভর্তির ক্ষেত্রে অগ্রগতিরই প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু এর পরও দেখা যাচ্ছে উল্লিখিত দীর্ঘদিনের বাস্তব চিত্রটি— বিপুলসংখ্যক ছাত্রছাত্রী এখনও ঝরে যাচ্ছে মাঝপথে।

আমাদের দেশে বিংশ শতাব্দীর এই সর্বশেষ প্রান্তে এসেও দেখা যায়, দেশের বহু স্থানে এখনও কোন স্কুল নেই। অনেক স্থানে জরাজীর্ণ স্কুল ভবন, কোথাও ছাত্রছাত্রী বসার প্রয়োজনীয় বেঞ্চিও নেই। কোথাও প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষকও নেই। কোথাও অভাব শিক্ষা সরঞ্জামের।

এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, গ্রামীণ দারিদ্র্য ও দুরবস্থার কারণেই বাধাগ্রস্ত হচ্ছে শিক্ষার প্রসার। শুধু স্কুল নেই বলেই যে অনেক শিশু পড়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছে তাই নয়, স্কুল থাকা সত্ত্বেও বহু এলাকায় স্কুলবয়সী ছেলেমেয়েরা স্কুলে না গিয়ে নিজেদের দরিদ্র পরিবারের আয়ের জন্য কাজে লাগে। স্কুল থেকে ঝরে পড়ার পিছনে বড় কারণ এটাই।

সুতরাং শিক্ষার প্রসার ঘটানোর কাজে সাফল্য আনতে চাইলে এই বাস্তবতাকে বিবেচনা করে নতুন নতুন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাসহ দারিদ্র্য বিমোচনের কাজকেও ত্বরান্বিত করতে হবে। কারণ দারিদ্র্য শিক্ষা বিস্তারে বড় রকমের একটি প্রতিবন্ধক, এটি প্রমাণিত সত্য।

২০০৬ সালের মধ্যে দেশকে নিরক্ষরতামুক্ত করার উদ্যোগ রয়েছে। এই লক্ষ্যে প্রতি গ্রামে একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনাও আছে। এগুলোসহ শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল পরিকল্পনা ও কর্মসূচীর সুষ্ঠু বাস্তবায়নের কাজ ত্বরান্বিত করা জরুরী। আগামী শতাব্দীর প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন, বিশেষ করে এই ক্ষেত্রে গ্রামীণ অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে গ্রহণ করতে হবে জোরাল কর্মসূচী। সকল ক্ষেত্রে অবস্থার উন্নতি হলে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রেও পাওয়া যাবে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য।